প্রথম আলো

তারিখ ..01 FEB. 2014...
পৃষ্ঠা ...১২... কলাম ...২......

খোলা হাওয়া

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

শিক্ষা নিয়ে ভুলোমনা হওয়া যায় না

গত ছয়-সাত মাস সারা দেশে যখন সহিংস কর্মসূচির চর্চা চলছিল, অর্থনীতি, কৃষি, যোগাযোগসহ বিপুল ক্ষতি হচ্ছিল আমাদের শিক্ষা খাতে। কিন্তু অর্থনীতির ক্ষতি একদিন পুষিয়ে নেওয়া যায়, কৃষিতে এক মৌসুমের ক্ষতি আরেক মৌসুমে কাটিয়ে ওঠা যায়, যোগাযোগের ক্ষতিও মেরামত হয়, শুধু শিক্ষায় যে ক্ষতি হয়, তা আর পূরণ হয় না। এ ক্ষতিটা যে শুধু ক্লাস করতে না পারার অথবা পরীক্ষা দিতে না পারার, তা নয়; এ ক্ষতিটা হয় আরও গভীরে। শিক্ষাকে আমরা, নানা কিছুর সঙ্গে, বলি মূল্যবোধের চর্চা। এই চর্চায় ছেদ পড়লে শিক্ষার্থীদের মনস্তত্ত্বে জটিল প্রভাব পড়ে। ডিসেম্বর মাসে একটি কাগজের শিরোনাম ছিল এ রকম—'স্কুলে যেতে না পেরে শিশুরা হতাশায় ভুগছে'। কাগজটি লিখেছে, সমাজে সহিংসতা বাড়ছে, মাদকের বিস্তার বাড়ছে, যেহেতু সুস্থ চর্চাগুলো রুদ্ধ হচ্ছে। স্কুলে যাওয়ার মতো শুদ্ধ চর্চা আর দ্বিতীয়টি নেই, বিশেষ করে যে স্কুলে শিক্ষার পাশাপাশি মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির পাঠগুলো শেখানো হয়। ক্রমাগত সহিংসতায় শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে একসময় একটা দাবি উঠেছিল, 'শিক্ষাকে রাজনীতির বাইরে রাখুন'। দাবিটা আগেও উঠেছে, কিন্তু এবার এর পেছনে একটা বিরাট শঙ্কাও ছিল। শঙ্কাটা ছিল আমাদের রাজনীতির তাণ্ডবমনস্কতার কারণে। জানুয়ারির শুরুতে স্কুলে স্কুলে যখন নতুন বইয়ের উৎসব হলো, শঙ্কাটা অনেকটাই কেটে গেল। কিন্তু আমরা জানি, তাণ্ডব শুরু হতে পারে যেকোনো সময়। যেকোনো অছিলায়। আমাদের শিশুরা এখন আর আমাদের অগ্রাধিকারের তালিকায় নেই।

নেই যে তার এক প্রমাণ দেশের অনেক জায়গায় মন্ত্রী-এমপিদের সংবর্ধনায় স্কুলের শিশুদের ব্যবহার। ব্যবহার কথাটাই এখানে খাটে। যেহেতু তাদের সান্ত্রি-সেপাই, বাঁশের তোরণ আর রংবেরঙের পোস্টার-বেলুনের মতোই গণ্য করা হচ্ছে। এক প্রতিমন্ত্রী সংবর্ধনায় তাঁর হাতে যখন নৌকা তুলে দেওয়া হচ্ছে, বাইরে অভুক্ত শিশুরা কষ্ট পাচ্ছে—খবরের কাগজে এ রকম একটি গল্প দেখে আমার মনে হলো আমরা বোধ হয় মানসিকভাবে আইয়ুব খানের আমল থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনি। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান একবার সিলেট গেলেন, আর স্কুলপড়ুয়া আমরা হাজার খানেক শিক্ষার্থী দল বেঁধে তাঁকে 'সংবর্ধনা' দিতে গেলাম। আমাদের শিক্ষকেরা আমাদের নিয়ে গেলেন, যাকে বলে, 'জেলা প্রশাসক কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া'। ঘণ্টা তিনেক দাঁড়িয়ে একসময় আমরা ফিল্ড মার্শালের গাড়িটা দেখলাম এবং গাড়ির কাচের ভেতর দিয়ে সংবর্ধিত ফিল্ড মার্শালের গালের একটি অংশ। ব্যস। এ জন্য নষ্ট হলো একটি আস্ত দিন। এক হাজার শিক্ষার্থীর এক হাজার দিন। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অপচয় ফিল্ড মার্শালের বোঝার কথা নয়, কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের? শিক্ষার্থীদের এ রকম সংবর্ধনায় বরপক্ষ অথবা কনেপক্ষ হওয়ার ব্যাপারে একটা নিষেধাজ্ঞা আছে। কিন্তু বাবুদের থেকে পারিষদরা অনেক বেশি তৎপর বলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক অথবা স্কুল পরিচালনা পরিষদের কর্তাব্যক্তিরা তা মানেন না। আর আইনপ্রণেতারা যখন আইন ভাঙেন বা কোনো মূল্যবোধের অমর্যাদা করেন, তখন শঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না। তবে আনন্দের কথা, শিক্ষামন্ত্রী দ্রুতই ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন—নিষেধাজ্ঞাটি আবার নতুন করে জারি করা হয়েছে। আশা করি, এবার শিক্ষার্থীদের রেহাই দেবেন রাজনীতিবিদেরা।

শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে উদ্যমী। তাঁর নিষ্ঠাও আছে শিক্ষার উন্নয়নে। কিন্তু শিক্ষা এমন একটি বিষয়, যেখানে রাষ্ট্র ও সমাজ সর্বোচ্চ বিনিয়োগ না করলে, নিরবচ্ছিন্ন কর্মযোগ ও নীতিসহায়তা না থাকলে সরকারের অগ্রাধিকার তালিকার শীর্ষে না থাকলে এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয় প্রবাদীয় সেই বানরের মতো, তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে যে এক মিনিটে তিন ফুট উঠলে পরের মিনিটে নেমে যায় চার ফুট। আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রে যে নিষ্ঠা দেখাই, শিক্ষাক্ষেত্রে তা দেখাই না; সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের যেমন ভুলোমনা প্রমাণ করি, শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাই।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। এমপিওভুক্ত হোক আর না হোক, কোনো স্কুলশিক্ষার্থীদের থেকে উচ্চ হারে ভর্তি ফি, বিশেষ করে উন্নয়ন ফি, যাতে না নেয়, সে ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। বিধানটি নতুন করে সম্প্রতি আবার জারি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বাংলা মাধ্যমে শিক্ষার্থীপ্রতি উন্নয়ন ফি সর্বোচ্চ তিন হাজার ও ইংরেজি মাধ্যমে পাঁচ হাজারসহ ভর্তি ফি যথাক্রমে আট ও দশ হাজার টাকার বেশি নেওয়া যাবে না। এক টিভি চ্যানেলের এক তরুণ সাংবাদিক সেদিন আমাকে জানালেন, তিনি ঢাকা শহরের অনেকগুলো স্কুল ঘুরে দেখেছেন, এই নিয়মটি কোথাও পালিত হচ্ছে না। কোনো কোনো নন-এমপিওভুক্ত স্কুলের প্রধান তাঁকে জানিয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই নির্দেশনাটি প্রযোজ্য নয়। অথচ নির্দেশনায় পরিষ্কার লেখা আছে, সব স্কুলের ক্ষেত্রেই এটি একটি বাধ্যবাধকতা। আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে জেনেছি, অনেক স্কুল, বিশেষ করে নামীদামি স্কুলগুলো অনেক উচ্চহারে উন্নয়ন ফি আদায় করছে। সন্তানের শিক্ষার প্রশ্নে পিতামাতা দুর্বল; একটি ভালো স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করাতে পারলে এভারেস্ট জয় করা হয়ে যায়। ফলে ধারকর্জ করে হলেও 'উন্নয়নের' টাকাটা জোগাড় করতে হয়। স্কুলগুলোর তাই পোয়াবারো।

একজন টিভি সাংবাদিক যা জানেন, সরকারের সত্যসন্ধ লোকজনের নিশ্চয় তার থেকে বেশি জানার কথা। কিন্তু সরকার মৌলিকভাবে ভুলোমনা। স্কুলগুলোতে ভর্তির মৌসুম আসে, স্কুলগুলোও ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে দেয়। মিডিয়াতে হইচই হয়, সরকার 'ব্যবস্থা নেওয়া হবে' বলে হুংকার ছাড়ে। ১৫ দিন, বড়জোর এক মাস। তারপর মিডিয়ার রাডার থেকে বিষয়টি হারিয়ে যায়, সরকারের মন থেকেও। এই এত বছর যে এত অনিয়ম হলো ভর্তি নিয়ে, একটি স্কুলও কি শাস্তি পেল? শিক্ষাকে আমরা রাজনীতি থেকে দূরে রাখার দাবি জানাচ্ছি। কিন্তু বাণিজ্য থেকে দূরে রাখা কি একই রকম জরুরি নয়? আর এ বাণিজ্য হচ্ছে খোদ স্কুলগুলোতেই। ভর্তি-বাণিজ্যের সঙ্গে আছে টিউশন-বাণিজ্য, কোচিং-বাণিজ্য। এখন বাণিজ্যের যুগ, সেটা মানলাম। তাই বলে স্কুল পেরোনোর আগেই এত রকম বাণিজ্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত হতে হবে? সেই বাণিজ্যের কাঁচামাল হতে হবে?

টিউশন-বাণিজ্য হচ্ছে সরকারি ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের মতো। এটি থামানো কঠিন। অসম্ভব না হলেও, কিন্তু লাভ-লোকসানের প্রশ্ন যেখানে জড়িত, সেখানে ব্যবস্থা গ্রহণ তখনি কার্যকর হবে, যখন মূল কারণগুলোর সুরাহা করা যাবে। কিছুদিন আগে ভুটানে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে কিছু আশ্চর্য ঘটনার সঙ্গে পরিচয় ঘটল। এর একটি হলো, ওই দেশের ডাক্তাররা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারেন না। সবাই সরকারি ডাক্তার। দেশের সাত লাখের মতো মানুষ স্বাস্থ্যসেবার জন্য হাসপাতালে যায়, সেখানে দিনরাত ডাক্তার থাকেন। আমি যে হোটেলে ছিলাম, সেই হোটেলের ম্যানেজার আমাকে জানালেন, জরুরি অবস্থায় ফোন করলে অ্যাম্বুলেন্স এসে রোগীকে হাসপাতাল নিয়ে যায়। এক বাংলাদেশি-ভুটানি ডাক্তার দম্পতির সঙ্গে পরিচয় হলো। তাঁরা যে বেতন-ভাতা পান, তাতেই খুশি। অবশ্য ভুটানের মানুষ অল্পতেই সন্তুষ্ট। এ জন্য সুখ-নির্দেশিকায় তারা পৃথিবীতে পয়লা নম্বর দেশ।

আমাদের দেশেও শিক্ষক ও ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করতে হলে এ দুই পেশার মানুষদের বেতন বাড়াতে হবে। একজন ডাক্তারকে যদি ভালো বেতন দেওয়া হয়, জীবনধারণের সব সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে হাসপাতালে-সরকারি ক্লিনিকে সার্বক্ষণিক সময় না দেওয়ার পক্ষে তাঁর কোনো কারণ থাকবে না। একই কথা শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও বলা যায়। এক প্রাইমারি স্কুলশিক্ষক আমাকে দুঃখ করে বলেছিলেন, তাঁর মাসিক বেতনে দুবেলা ঠিকমতো খাবার জোটানো কষ্টকর। তাঁর মর্যাদা একজন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর। অথচ তাঁকে আমরা একটা গালভরা বুলিতে সংবর্ধনা জানাই—'মানুষ গড়ার কারিগর' বটে।

গোড়াতে এত বড় গলদ রেখে আমরা কতটা আর এগোব। এ জন্য মন্ত্রী-সাংসদের অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য তাঁরা শিক্ষার্থীদের নিয়ে রোদে দাঁড়ান, জীবনমান উন্নত করার সংগ্রামে শহীদ মিনারে অনশন করেন এবং পুলিশের জলকামানের সামনে পড়েন। আমাদের মূল্যবোধের ঘরে এত বড় একটা ফাঁক রেখে আমরা তাই শিক্ষা নিয়ে সুস্থ চিন্তা করতে পারি না। শিক্ষা তাই বাণিজ্য হয়ে যায়, রক্ষকেরা ভক্ষক হয়ে যান। কোনটা ন্যায্য, কোনটা অন্যায্য—এই বিবেচনাটাও আর থাকে না। রাজনীতির পেছনে যে কল্পচিন্তা তা তখন শিক্ষাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনে না।

স্কুলগুলো ভর্তির মৌসুমে বাণিজ্য করলেও সরকারও আর ভ্রূ কুঁচকে তাকায় না।

২.

শিক্ষা নিয়ে এই যে হ-য-ব-র-ল অবস্থা, দেশের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে অস্থিরতা, সারা দেশে সহিংসতা এবং উগ্রপন্থার বিস্তার—এসবের একটা সমাধান অবশ্য আছে। অন্তত আমার কল্পনায় একটা সমাধান আমি দেখি এবং এটি এমন এক সমাধান, যার সুফল প্রজন্মের পর প্রজন্ম পাবে।

সমাধানটা এই: সরকার শিক্ষাকে জাতীয় বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে ধরুক এবং সব রাজনৈতিক দল তাতে সহমত পোষণ করুক।

শুরুটা হোক প্রাইমারি স্কুল দিয়ে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপ্তি হোক। ষাট-সত্তর-হাজার প্রাইমারি স্কুলে বিশাল বিনিয়োগ হোক। চমৎকার স্কুলঘর, গ্রন্থাগার, কম্পিউটার, খেলার মাঠ, ছেলেদের-মেয়েদের ক্রিকেট, ফুটবল দল হোক, বিনা মূল্যে শিক্ষার্থীদের টিফিন, দুপুরের খাবার দেওয়া হোক। বিনা মূল্যে সব বই ও শিক্ষা উপকরণ দেওয়া হোক। বছরের দুই-তিন মাস ছুটি থাকুক কিন্তু শিক্ষার্থীদের এই সময়টা নিয়মানুবর্তিতা, নাটক-গান-আবৃত্তি-বিতর্ক-সাঁতার শেখানো হোক; ভাষা-গণিত-বিজ্ঞান উৎসব হোক প্রতিটি স্কুলে। শিক্ষকদের বেতন হোক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমান বা তার থেকে বেশি। তাঁদের জন্য বিনা ভাড়ায় ব্যবস্থা করা হোক বাসস্থানের। জোর দেওয়া হোক ভাষা, গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষায়। মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং সংস্কৃতির শিক্ষাকে শিক্ষার্থীরা যাতে জীবনে ধারণ করে, সেই দিকে জোর দেওয়া হোক। পরের ধাপে এগোনো যাক মাধ্যমিক স্কুল দিয়ে।

দুই থেকে তিন প্রজন্ম—শুধু শিক্ষা নয়, আমাদের তাণ্ডবপ্রবণ। রাজনীতিতেও ঘটে যাবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আমার এই বিশ্বাস নিয়ে আমি যুদ্ধে নামতেও প্রস্তুত!

রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

● সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: কথাসাহিত্যিক। অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।